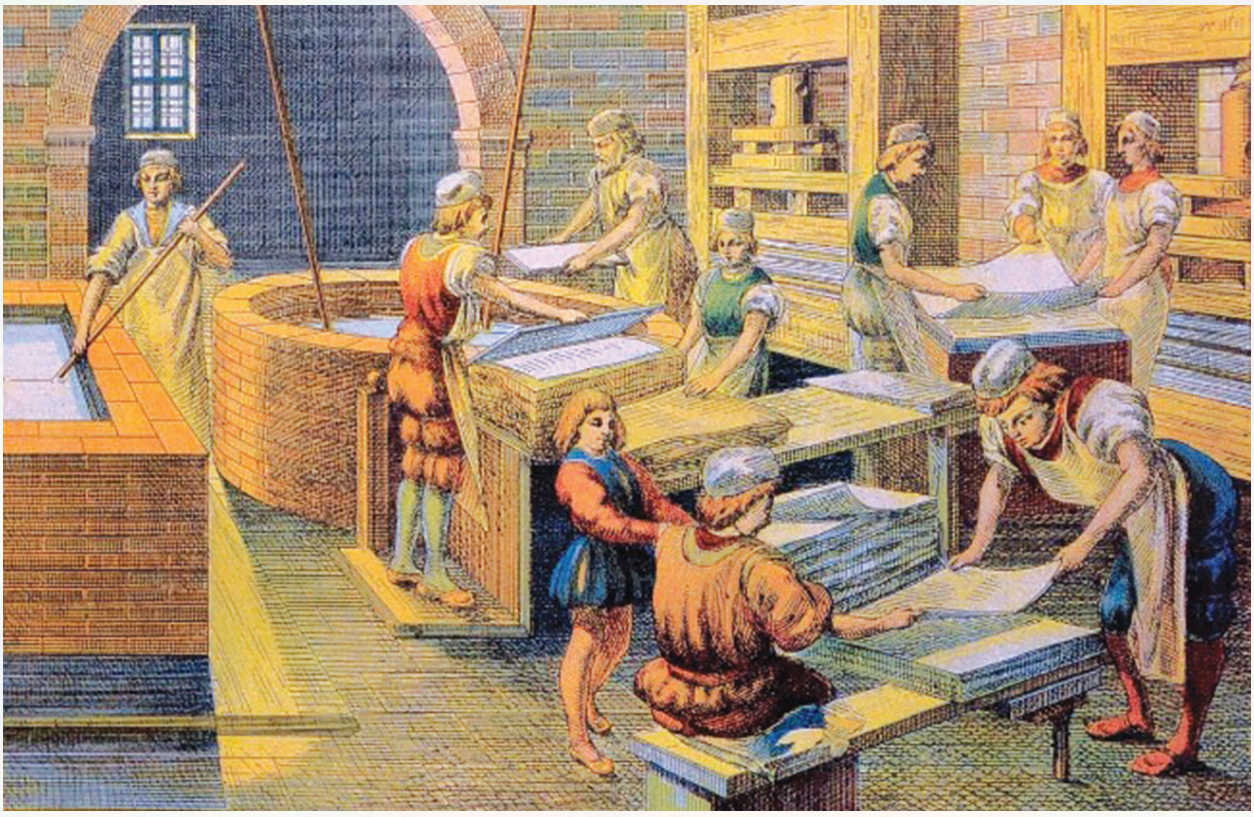

কাগজের আদ্যোপান্ত

*যেসব আবিষ্কার মানবজাতির উন্নতির পেছনে বিশেষ ভূমিকা রাখে তার মধ্যে কাগজ অন্যতম। বই পড়া থেকে শুধু করে পরীক্ষার খাতায় কঠিন প্রশ্ন সমাধান করা সব ক্ষেত্রেই কাগজের ব্যবহার লক্ষণীয়। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করা কিংবা মনের অনুভূতি লিখে রাখার জন্য কাগজ ব্যবহার হয়। তবে দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি কিভাবে আমাদের কাছে এলো সে সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানিনা। **গোলাম মোর্শেদ সীমান্তের** প্রতিবেদনে কাগজ ইতিহাসের আদ্যোপান্ত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো।*

কাগজের ইংরেজি নাম পেপার। এই পেপার শব্দের পারিভাষিক প্রতিশব্দ হচ্ছে কাগজ। বাংলায় 'কাগজ' একটি ফারসি শব্দ। প্রাচীন মিশরের প্যাপিরাস নামক লেখার বস্তু থেকে পেপার শব্দটি এসেছে। কাগজ বলতে আমরা এক ধরনের অত্যন্ত পাতলা বস্তু বা উপাদান বুঝি। যা সাধারণত লিখতে, চিত্র অঙ্কনে ব্যবহার করা হয়। লেখা ছাড়াও কাগজের উপরে লেখা ছাপানো হয় এবং দ্রব্যের মোড়ক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

প্রথম কাগজ তৈরি হয় আজ থেকে প্রায় ২০০০ বছর আগে, চীনা রাজা হানের আমলে। সেসময় কাই লুন নামক অধিবাসী প্রথম কাগজ তৈরি করেন। তৎকালীন সময়ে সিল্কের কাপড়ে লেখা হতো। তবে সিল্ক বেশ ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে এমন জিনিস আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় যা সিল্কের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। তাই লুন লেখালেখির জন্য এমন কিছু আবিষ্কার করতে চাচ্ছিলেন যেটা হালকা ও সস্তা হবে। এভাবে ভাবতে ভাবতে একসময় তিনি কাগজ তৈরি করে ফেলেন। কাগজ তৈরির উপাদান হিসেবে তিনি ব্যবহার করেন তুঁত, ভাং পাতা ও গাছের ছালসহ আরো কিছু পদার্থ। এগুলো একসঙ্গে একটি মণ্ডের মতো তৈরি করেন এবং রোদে শুকিয়ে কাগজ তৈরি করেন। কাই লুনের বানানো কাগজগুলো ছিল খুব চকচকে, মসৃণ এবং কোমল। তাই চীনে সিল্কের সাশ্রয়ী এবং কার্যকর বিকল্প হিসেবে তার তৈরি কাগজের ব্যবহার শুরু হয়। যার ফলে কাগজ প্রাচীন চীনের চারটি বিশাল উদ্ভাবনের মধ্যে একটিতে পরিণত হয়। অষ্টম শতকের দিকে কাগজ তৈরির এই পদ্ধতি সম্পর্কে মুসলিম শাসকরা জানতে পারেন এবং পরবর্তীতে তাদের হাত ধরে ইউরোপে এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে আদি ভারতে হিন্দু রাজাদের শাসনামলে তালপাতা, কলাপাতা, সুপারি বা নারিকেল গাছের খোসা ভূর্জপত্র এবং অন্যান্য পত্রে লেখালেখির প্রচলন ছিল। সে সময় কোনো জরুরি বিষয় লিখতে তামার এবং কাঠের বিভিন্ন অক্ষর ও চিহ্ন তৈরি করা হতো। যা ওই সময়ে রাজা ও মহাজনদের খাতা হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং তাতে আয়-ব্যয়ের হিসাব লেখা হতো। ভুটানে, নেপালে এবং আসামেও এমন নমুনা পাওয়া যায়।

চীন কাগজ উৎপাদন করলেও এটির বিকাশ এ অগ্রগতির পেছনে মূল ভূমিকায় ছিল ইউরোপ। কারণ এর আগে ইউরোপীয়দের কাগজের তেমন দরকার ছিল না। কারণ তারা তখন কাগজের বিকল্প হিসেবে পার্চমেন্ট ব্যবহার করতো। তবে এটি ছিল বেশ দামী। পার্চমেন্টের একটি বাইবেল বানাতে প্রয়োজন হতো প্রায় আড়াইশ ভেড়ার চামড়া। তবে যেহেতু খুব কম মানুষই পড়তে বা লিখতে পারতো, তাই পার্চমেন্টের দাম নিয়ে খুব

বেশি মাথা ঘামাতে হতো না তাদের। তবে যখন ইউরোপ বাণিজ্যের দিকে নজর দেয়, চুক্তিপত্র বা হিসাব রাখার জন্য লেখালেখির প্রয়োজন হয়, তখনই কাগজের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। তবে তৎকালীন সময়ের কাগজগুলো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট ছিল না তাই আবির্ভাব হয় প্রকাশনা শিল্পের।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যযুগে ইউরোপে কাগজের উৎপাদন শুরু হয়। যেখানে সর্বপ্রথম পানি-চালিত কাগজ উৎপাদনের কাগজকল ও কলকব্জা বা মেশিন আবিষ্কার ও নির্মাণ করা হয়। তবে অতিরিক্ত খরচ এবং জটিল প্রক্রিয়ার কারণে তা আশানুরূপ সফলতা পায়নি। ১৮৪৪ সালে কানাডিয়ান উদ্ভাবক চার্লিস ফেনট্রি এবং জার্মান উদ্ভাবক এফজি কিলার যৌথভাবে কাগজ তৈরির মূল উপাদান হিসেবে কাঠের মণ্ড তৈরি করার মেশিন ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। যার ফলে চিঠি, সংবাদপত্র ও বইয়ের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সাশ্রয়ী উপাদান হিসেবে তৈরি করা কাগজ উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন শিল্প রূপে আবির্ভূত হয়।

জার্মানির মাইঞ্জ শহরের স্বর্ণকার ইয়োহানেস গুটেনবার্গকে প্রিন্টিং প্রেসের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকবে এরকম প্রচুর সংখ্যক ধাতব অক্ষর (মেটাল টাইপ) কীভাবে তৈরি করা যায় এবং সেগুলোকে পাশাপাশি রেখে কীভাবে একটি পৃষ্ঠার শত শত কপি বানানো যায় সে প্রযুক্তি নির্মাণ করেন। অন্যদিকে মেটাল টাইপগুলোকে পুনরায় সাজিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পৃষ্ঠা প্রিন্ট করার পদ্ধতিও বের করেন তিনি। পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার পেছনে গুটেনবার্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন সময়ে ইউরোপ পুনর্গঠিত হয় বিজ্ঞান, সংবাদপত্র, উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে যার মূলে ছিল গুটেনবার্গ উদ্ভাবিত প্রেস।

আমাদের দেশেও ২০১১ সালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট সহজলভ্য ও পরিবেশবান্ধব ধইঞ্চা গাছের আঁশ দিয়ে কাগজ তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করে। যা খুব সাশ্রয়ী একটি পদ্ধতি। ধইঞ্চা জমির উর্বরতা বাড়ায়। ধইঞ্চার গাছের আঁশ ব্যবহার করে সাধারণ বায়ুচাপে ৬০ থেকে ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ সালফার ও ক্লোরিনমুক্ত পদ্ধতিতে কাগজ তৈরি করা যায়, যা বেশ পরিবেশবান্ধব। এছাড়াও পরিবেশবান্ধব ক্লোরিন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে একই সঙ্গে ডাইজেসন ও ব্লিচিংয়ের কাজ সম্পন্ন করা যায় এই প্রক্রিয়ায়। যার কারণে এতে জ্বালানি কম লাগে এবং সাশ্রয়ী। এছাড়া কলকারখানার নির্গত ধোঁয়া থেকে কাগজ তৈরির কাঁচামাল প্রিসিপিটেটেড ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি করা যায়।

এতক্ষণ জানলাম কাগজের ইতিহাস সম্পর্কে, কিভাবে এটি এলো আমাদের হাতের নাগালে। তবে বর্তমানে কাগজ শুধুমাত্র লেখালেখির জন্য

নয় সৃজনশীল কাজেও এটি ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে জেনে আসা যাক।

অরিগ্যামি

অরিগ্যামি জনপ্রিয় একটি কাগজ শিল্প। জাপানে এর উৎপত্তি হয় সর্বপ্রথম। জাপানি শব্দ 'Ori' এর অর্থ হলো 'ভাঁজ করা' আর 'Kami' অর্থ 'কাগজ'। 'Orikami' থেকেই 'Origami' অর্থাৎ কাগজকে ভাঁজ করে যে শিল্প, সেটাই আসলে অরিগ্যামি। চারকোণা একটি কাগজকে ভাঁজ করে নানারকম জিনিসপত্র তৈরি করা হয় এই শিল্পে। অরিগ্যামিতে প্রকৃতি ও দেশীয় ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলা হয়।

থ্রি-ডি অরিগ্যামি

থ্রি-ডি অরিগ্যামি মূলত প্রচলিত অরিগ্যামির আধুনিক রূপ। এই পদ্ধতিতে সাধারণ অরিগ্যামি দিয়ে কতগুলো ছোট ছোট টুকরা তৈরি করা হয়, যা থ্রি-ডি অরিগ্যামির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে সেসব ছোট ছোট অরিগ্যামিকে জোড়া দিয়ে নানারকম আকৃতি দেওয়া হয়। ঘর সাজাতে শো-পিস হিসেবে এর জুড়ি মেলা ভার।

কিরিগ্যামি

কিরিগ্যামিও একটি জাপানি কাগজ শিল্পের নাম। 'Kiru' অর্থ কাটা আর 'Kami' অর্থ হল কাগজ। 'Kirukami' থেকেই Kirigami' মূলত কিরিগ্যামি অরিগ্যামির মতোই, তবে অরিগ্যামিতে শুধুই ভাঁজ করতে হয়, কাটাকাটি ব্যাপার থাকে না আর কিরিগ্যামিতে কাগজ কেটে সেটিকে নতুন রূপ দেওয়া হয়। কিরিগ্যামির বেশ কিছু ধারা আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারাটি হলো স্নোফ্লেক্স। কাগজকে ভাঁজ করে ইচ্ছেমত কেটে-কুটে ভাঁজ খুলে দিলেই অদ্ভুত সুন্দর সব প্যাটার্ন তৈরি হয়ে যায়! সেগুলোকে কার্ড বানানোর সময় স্ট্যাম্পিংয়ের কাজে বা গিফট প্যাকেজ অথবা যেকোনো কাগজের সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

কুইলিং

ইচ্ছেমতো মাপে কাগজের অনেকগুলো স্ট্রাইপ কেটে নিয়ে সেগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানানরকম আকার দিয়ে যে রূপ দেওয়া হয় তাকেই কুইলিং বলে। রেনেসাঁ যুগে ফরাসি ও ইতালিয়রা ধর্মীয় গ্রন্থের প্রচ্ছদ সাজাতে কুইলিং ব্যবহার করতেন।

মিক্স-মিডিয়া

এই শিল্পে কয়েক ধরনের কাগজ বা বোতাম, শুকনা ফুল, চুমকি, রঙ, সুতা বা কাপড় ইত্যাদি অনেক কিছু ব্যবহার করে স্কেচ বুকে একটি ছবির মতো করে তৈরি করা হয়।

পেপার ম্যাশে

কাগজের মণ্ড দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি হয় এই শিল্পে। এজন্য কাগজকে কিছুদিন ভিজিয়ে রেখে একটি মণ্ড তৈরি করতে হয়। সঙ্গে আটা কিংবা ময়দা দিয়ে আরও মজবুত করা হয় মণ্ডটিকে। এরপর সেটি দিয়ে হ্যান্ড-মেইড কাগজ থেকে শুরু করে আসবাবও তৈরি করে ফেলা যায়।

কাগজ দিয়ে বই তৈরি করা হয়। তাই জানার চেষ্টা করেছিলাম পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি বই কোনটি! অনুসন্ধান করে পেলাম পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বই লিওনার্দো দা ভিঞ্চির লেখা "Codex Leicester" বইটি। বাংলাদেশি টাকায় যার আনুমানিক মূল্য ৩২০ কোটি টাকা।